Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 241–253
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাণী বসুর আখ্যানবিশ্ব মহাভারত : নারীর আত্মভাষ্য ও বিবিধ

ড. দীপকচন্দ্র বর্মন
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : idipakbarman@gmail.com

মাধব মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : madhabmandal08@gmail.com

Keyword
বাণী বসু, মহাভারত, পুরাণ-ইতিহাসরস, উত্তরকাল, নারীর আত্মস্বর

Abstract
পুরাণ-ইতিহাস-আলোকিত অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞানের অভিব্যক্তি সাহিত্যে যে পুরাণ-ইতিহাস রসের আস্বাদ দেয় তা চিরকালের পাঠকের কাছে আস্বাদ্য। এ জাতীয় কথন পদ্ধতিতে উত্তরকালের সৃজনকর্মীরা যে অব্যক্ত ও প্রচ্ছন্ন থেকে যাওয়া অনালোকিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন তা প্রত্যাশিত। এই পরম্পরানুগ পথ পরিক্রমায় উপন্যাসের নান্দনিক আখ্যান পরিসর নির্মাণের ক্ষেত্রসন্ধানী লেখিকা হিসেবে বাণী বসু অবশ্যই ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর সাহিত্যকৃতির বৃহৎ পরিসরে পুরাণের বিনির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি মহাভারতের আদি পর্বের শান্তনুর জীবনকথা থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপর্বের প্রাসঙ্গিকতা এই প্রব্যাপ্ত প্রেক্ষাপটকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত তত্ত্ববীক্ষায় অনায়াসে গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'কালিন্দী', 'ক্ষত্রবধূ', 'ক্ষত্তা', 'কৃষ্ণ', 'সুযোধন-দুর্যোধন', 'পাঞ্চাল কন্যা কৃষ্ণা' প্রভৃতি আখ্যান মহাভারতের এমন সব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিশেষত সমকালীন নারীর স্বর চিহ্নায়ক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রচলিত, পরম্পরাগত ধারণা অনুযায়ী নারী এখনও 'অপরসত্তা' হিসেবে চিহ্নিত এবং সেইসঙ্গে উপেক্ষিত। এই ধারণার প্রতিপাঠ হিসেবে বাণী বসুর নির্বাচিত পুরাণ নির্ভর আখ্যানে নারীর 'আত্মস্বর'কে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বর্তমান প্রবন্ধ পরিকল্পনা।

Discussion
পুরাণ-ইতিহাস আলোকিত অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞানের অভিব্যক্তি সাহিত্যে যে পুরাণ-ইতিহাসরসের আস্বাদ দেয় তা চিরকালের পাঠকের কাছে আস্বাদ্য। এজাতীয় কথনপদ্ধতিতে উত্তরকালের সৃজনকর্মীরা অব্যক্ত ও প্রচ্ছন্ন থেকে যাওয়া অনালোকিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে থাকেন। এই পরম্পরা সূত্র ধরে রামায়ণ-মহাভারতের প্রাসঙ্গিক আখ্যান উত্তরকালের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার্য হয়ে আধুনিক লেখকের নির্মাণকৌশলে বিনির্মাণের সন্ধানী পথে পাঠকের মননবিশ্বকে নাড়িয়ে তোলে। সাহিত্যের নান্দনিক পরিসরে পুরাকাহিনির এই বিনির্মিত আখ্যানবিশ্ব আধুনিক পাঠকের কাছে সমাদরের প্রাণবস্তু হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সময়ের স্বর অনুধাবনকারী সাহিত্যিক বাণী বসু তাঁর সাহিত্যচর্চার বৃহৎ পরিসরে পুরাণের বিনির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি

মহাভারতের আদিপর্বের শান্তনুর জীবনকথা থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপর্বের প্রাসঙ্গিকতা এই প্রব্যাপ্ত প্রেক্ষাপটকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত তত্ত্ববীক্ষায় অনায়াসে গ্রহণ করেছেন। বাণী বসু 'কালিন্দী' (২০১৬), 'কৃষ্ণ' (২০১৬), 'ক্ষত্রবধূ' (২০১৭) 'ক্ষত্তা' (২০১৭), 'সুযোধন-দুর্যোধন' (২০১৮), 'পাঞ্চাল কন্যা কৃষ্ণা' (২০১৮) প্রভৃতি আখ্যানে মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির গতি-প্রকৃতি, বহুমাত্রিক প্রকাশ পুরাণ অনুসন্ধানী শিল্পীসত্তার পরিচয়বাহী। আখ্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে অব্যক্তের উন্মোচন, অস্তিত্বের প্রতিস্থাপন, শোষণ-নিপীড়নের বিনাশ, নারী সম্মান-মর্যাদা-অধিকার গুরুত্ব পেয়েছে। বিনির্মাণের গুরুত্ব পর্যালোচনায় তত্ত্ববিদ ক্রিস্টোফার নোরিসের বক্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক-

> "Deconstruction is a constant reminder of the etymological link between 'crisis' and 'criticism'."[১]

স্বভাবত সমাজ-সাহিত্যের সঙ্কটকালে পুরাকথাকে হাতিয়ার করে সমকালের জীবনকথন, ব্যক্তি-সমাজ বিশ্লেষণের কথাবয়ন নির্মাণের প্রবণতা একটি প্রচলিত কথনকৌশল হিসেবে গ্রহণীয়। পুরাকালের কোনো এক প্রেক্ষিত-প্রতীতি থেকে জন্ম নেওয়া সাহিত্যের বিনির্মাণশস্য হিসেবে উত্তরকালের আখ্যানকৃতি সমকাল চেতনার পাঠ হিসেবে যে নবমাত্রাদীপ্ত রসাবেদন সঞ্চারিত করার লক্ষ্য নিয়ে পাঠকের কাছে হাজির হয় তা বহুরূপতাগুণে পাঠককে আকৃষ্ট করে। রলাঁ বার্ত context, text, texture-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

> "মিথের অন্তর্লীন প্রেক্ষিতটি 'শিকড়', মিথের কাহিনিটি হচ্ছে 'ঐতিহ্য' আর তার বহির্বিন্যাসটি হল 'আধুনিক রূপান্তর'। অর্থ্যাৎ মিথের প্রত্নপ্রতিমার অবস্থান-স্তর হল Context ; তার ওপর গড়ে ওঠা কাহিনির অবস্থান স্তর হল Text (উপজীব্য); আর সেই কাহিনিকে ভেঙে গড়ে নতুন কাহিনির যখন সৃষ্টি করা হয়, তখন সেটি Texture (বিন্যাস) স্তরের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

মিথ কাহিনির মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় 'meaning', 'message' এবং 'communication'। মানুষের নিরেট কাঠামোময় জীবনতটিনীর প্রতিকূল প্রবাহের প্রতিকূলতাকে ইতিহাস-পুরাণের সহযোগে পাঠক মহলের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়। বাণী বসু সত্যবতী,দেবব্রত,পঞ্চপাণ্ডব, দ্রোপদীর চিত্রাঙ্কন করেছেন বর্তমান সমাজব্যবস্থার আলোকে। অজেয় রথে বসিয়ে তাঁদের নিয়ে গিয়েছেন মাটির গন্ধমাখা বাস্তবের আঙিনায়। যেখানে কাল্পনিকতা, যুক্তিহীনতার অস্তিত্ব নেই। কেবল সমাজ বাস্তবতার প্রাণ সঞ্চারই লক্ষ্য।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতিজাত পুরাণ-ইতিহাসের পুনর্জাগরণ, পুনর্নির্মাণের ধারা এখনও প্রবহমান। প্রাচীন ভারতবর্ষের জলবায়ু নিরক্ষীয়-ক্রান্তীয় শুষ্ক উষ্ণ প্রকৃতির হওয়ায় অধিকাংশ মানুষই নিকষ কালো, নাক ছড়ানো প্রকৃতির। লেখিকার যুক্তিতে নদী-অববাহিকার মানুষেরা শস্য উৎপাদনে লাভবান হতে হতে নগরকেন্দ্রিক আধুনিক মানসিকতার হয়ে ওঠেন। কিন্তু কৃষ্ণকায় অরণ্যবাসীরা নিজেদের আধুনিক মনষ্কতায় নিয়ে আসতে পারেননি। কারণ তারা পশুপালন, বন্যপশু শিকারের মধ্যেই নিজেদের বুদ্ধিশীলতাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। প্রাচীন ইতিহাসে যমুনার আরেক নাম ছিল কালিন্দী। বাণী বসু 'কালিন্দী' আখ্যানে জেলেপাড়ার আবহ চিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে স্বয়ং জেলে সর্দারের সন্তান নেই। তাই 'বাঁজা'র বদনাম ঘোঁচাতে জেলে সর্দারের স্ত্রী এক ক্ষত্রিয় রাজপুরুষের সঙ্গে রাত কাটান। জেলে সর্দার বুঝতে পারেন স্ত্রীর সদ্যজাত সন্তান তার ঔরসজাত নয়, তবু দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে শিশু সন্তানের মুখ সর্দারের মনে বয়ে নিয়ে আসে পরম প্রশান্তি। কন্যার জন্ম যমুনার বুকে হওয়ায় নাম রাখেন কালিন্দী। শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস রচিত মহাভারতের সত্যবতীকে বাণী বসু 'কালিন্দী' নামে অঙ্কন করেছেন। কালিন্দীর নাম পরিবর্তনের যৌক্তিক পাঠ হিসেবে এর একটি ভিন্নমাত্রিক গুরুত্ব রয়েছে। মহাভারতে সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে তিনি অভিশাপগ্রস্ত মৎস্যরূপিণী অপ্সরার গর্ভজাত কন্যা।

> "সা কন্যা দুহিতা তস্যা মৎস্যা মৎস্যসগন্ধিনী।
> রাজ্ঞা দত্তা চ দাশায় কন্যেয়ং তে ভবত্বিতি।।

রূপসত্ত্বসমাযুক্তা সর্ব্বৈ সমুদিতা গুণৈঃ।
সা তু সত্যবতী নাম মৎস্যঘাত্যভিসংশ্রয়াৎ।।"[৩]

বেদব্যাস রচিত মহাভারতে সত্যবতীকে 'মৎস্যগন্ধা', 'গন্ধবতী', 'যোজনগন্ধা' বলে ডাকা হলেও কালিন্দী নামের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বাণী বসু প্রকৃতপক্ষে সত্যবতীকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নির্মাণ করেছেন। অতিপ্রাকৃতের ক্ষীণ প্রাবল্যতায় চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করেছেন। লেখিকা চেয়েছিলেন সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্তকে ধোঁয়াশামুক্ত করে সম্পূর্ণ ভাবে ধীবরকন্যার পরিচয় দিতে। পাশাপাশি অসীম লাবণ্যের অধিকারী কন্যার পিতাও লাবণ্যময় হওয়া বাঞ্ছনীয়। ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ এবং ধীবরপত্নীর গর্ভজাত সন্তান কালিন্দীর হয়ে ওঠার কঠিন যাত্রা বাণী বসুর এই আখ্যান। ধীবরের ঘরে বড় হয়ে ওঠা কালিন্দীকে কেবল ধীবর দুনিয়ায় নয় রাজপরিবারের পুত্রবধূ বানিয়ে যশ-খ্যাতি-ঐশ্বর্য্য অর্জনের ধনলিপ্সার চতুর পরিকল্পনা করে জেলে সর্দার ভিল্ল। বছর পনেরো বয়স হতেই কালিন্দীর আস্তানা হয় যমুনার বুকে পাটনীর সাঁজে। তাঁর পরনে সামান্য গামছার ন্যায় অঙ্গবাস। মেয়ে ঘরে ফিরলে পিতার প্রথম জিজ্ঞাসা—

"কাকে কাকে পার করলি আজ।"[৪]

একদা হেমন্তের কুয়াশাকালে পরাশর মুনি কালিন্দীর নৌকায় যাত্রী হয়ে আসেন। প্রথমাবস্থায় কুরুক্ষেত্র যেতে চাইলেও পরে যমুনা নদীর সবুজ ঘেরা চরে গিয়ে মুনি কালিন্দীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে ওঠেন। মুনির দ্বারা বরপ্রাপ্ত হয়ে কালিন্দী এক অলোকসামান্য পুত্র লাভ করেন। দ্বীপের মাঝে মাতৃগর্ভধারণ হওয়ার কারণে নাম হয় দ্বৈপায়ন। বেদব্যাস মহাভারতভাষ্যে জানিয়েছেন—

"পরাশরস্য দায়াদং ত্বং পুত্রং জনয়িষ্যসি।
যো বেদমেকং ব্রহ্মর্ষিশ্চতুর্দ্ধা বিভাজিষ্যতি।।
মহাভিষক্ সুতস্যৈব শন্তনোঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনম।
জ্যেষ্ঠং চিত্রাঙ্গদং বীরং চিত্রবীরঞ্চ বিশ্রুতম।।"[৫]

অর্থ্যাৎ সত্যবতী পরাশরের ঔরসে যে পুত্র সন্তান লাভ করেন, সেই কৃষ্ণ এক বেদকে চার খণ্ডে বিভক্তের অসাধ্যসাধন করবেন। সত্যবতী মহারাজ শান্তনুর ঔরসে আরও দুটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন- চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। বাণী বসু সত্যবতীর সন্তানধারণ প্রসঙ্গ অপরিবর্তিত রেখে পারিপার্শ্বিক সংগ্রাম, কূটনীতির চরম পরিণতিগুলি যুক্তিজালে অঙ্কন করেছেন। লেখিকা দেখিয়েছেন কালিন্দী এক ক্ষত্রিয় রাজপুরুষের রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়ে ওঠেন। রাতের স্বপ্নেও সেই ক্ষত্রিয়কুমার ভালোলাগার ছোঁয়ায় ভরিয়ে তোলে কালিন্দীকে। এরই মাঝে একদা শান্তনু কালিন্দীর নৌকায় পারাপার করতে গিয়ে কালিন্দীর প্রতি মদনশরে বিদ্ধ হয়। মহারাজ শান্তনুর পুত্র কুমার দেবব্রত পিতার পাণিগ্রহণের জন্য কালিন্দীর সম্মতি আদায় করতে ধীবর সর্দারের দ্বারস্থ হন। যে প্রিয়কে ধ্যানে-জ্ঞানে ভালোবেসে কালিন্দী বুকে স্থান দিয়েছিলেন ; সেই প্রাণপুরুষই যখন তাঁর নিজের নয়, পিতার সম্বন্ধ নিয়ে আসেন তখন কালিন্দীর সর্বাঙ্গে বজ্রপাত ঘটে। ভালোবাসার এ এক নিদারুণ বৈপরীত্ব ও করুণ ট্র্যাজেডি! অবহেলিত কালিন্দী নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েই পিতৃসম পুরুষকে বররূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। একবিংশের নারী ইতিহাসে নারীরা অগ্রগামী হলেও আজও এমন স্বপ্নভঙ্গ নারীর দৃষ্টান্ত মিলবে বহু ধীবরপল্লিতে।

রাজা শান্তনু সত্যবতীকে খুশি করতে যে যৌবন ধরে রাখার ঔষুধ খেতেন, সে ঔষুধের বিষক্রিয়ায় কিছু বছর পর শান্তনুর শরীর ভেঙে যেতে থাকে। এদিকে সত্যবতীর দুটি সন্তান হলেও দুজনই কুরুবংশের রাজা হওয়ার মত বলবান বা বুদ্ধিমান কোনোটিই নয়। সত্যবতী ভাবে রাজা শান্তনু যদি এমতাবস্তায় দেবব্রতকে রাজসিংহাসনে বসার আদেশ দেন, দেবব্রত কি নিজ প্রতিজ্ঞার থেকে পিতৃ আজ্ঞাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন? রাম মাতৃ আজ্ঞা পালনে বনবাসে গেলেও তখন যদি পিতা দশরথ, মাতা কৈকেয়ী সিংহাসনে বসার আদেশ করতেন— তবে রাম কি সেই আদেশ অমান্য

করতে পারতেন? এই আখ্যান সাদৃশ্য এখানে লক্ষণীয়। মহারাজা শান্তনু মৃত্যুর পূর্বে দেবব্রতকে সিংহাসন অলংকৃত করার আদেশও দিয়ে যেতে পারেননি। এদিকে সত্যবতীর সন্তানেরা মহারাজ হওয়ার যোগ্যতম নয়।

"না হয়েছে রাজবাড়ির ছেলে, আর না হয়েছে জেলেবাড়ির ছেলে। আসলে এরা এক বৃদ্ধের দুর্বল শুক্রকণা।"[৬]

রাজা শান্তনুর মৃত্যুর পর প্রজাগণ দেবব্রতকে মহারাজের আসনে অলংকৃত করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সত্যবতীর পুত্র চিত্রাঙ্গদ সে সময় মৃগয়ায় গিয়ে আহত হয়ে মারা যান। রাজ্যাভিষেকের দিন সমবেত জনতার সামনে দেবব্রত প্রজাদের জানায় তাঁর পিতার দ্বিতীয় বিবাহের সম্বন্ধ করার কালে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমৃত্যু সিংহাসন অলংকৃত করা থেকে বিরত থাকবেন এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। দেবব্রতের মহত্ত্বে প্রজাগণ ধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠেন। হস্তিনাপুরে রাজ্যাভিষেক হয় বিচিত্রবীর্যের। ধীবর সর্দার ভিল্লর অভিলাষ ছিল— তাঁর রক্ত বহনকারী সন্তান হবে হস্তিনাপুরের রাজা। এই সূত্র ধরেই ধীবর সর্দারের বহু প্রতীক্ষিত ইচ্ছের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

বাণী বসু 'কালিন্দী' আখ্যানে দেবব্রতর জন্মবৃত্তান্ত সবিস্তার তুলে ধরেছেন। রাজা শান্তনুর প্রথম স্ত্রী ছিলেন গঙ্গাদেবী। হিমালয় যাঁর বাসভূমি, জহ্নু যাঁর পিতা। সেই অকূল পাথার গঙ্গা কেবল তীর্থস্বাদের আসায় মর্ত্যসুখে পতিত হয়েছেন। শান্তনু গঙ্গাকে তাঁর মহিষী হওয়ার প্রস্তাব দিলে গঙ্গা শর্ত রাখেন—

"আমার কোনো কাজে তা সে যত খারাপই লাগুক আপনার, আপনি বাধা দিতে পারবেন না।"[৭]

মর্ত্যের সমাজসংস্কার, নিয়মকানুনে আবদ্ধ থাকা শান্তনু গঙ্গার ন্যায় হিমালয়ের রমণীদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা, বন্ধনমুক্ত চিত্তে মনখুশির মত বিহার করা বিষয়গুলি তো জানতেন না। গঙ্গা প্রতিবছর তাঁর পুত্র সন্তানদের জলে ভাসিয়ে দিতেন। পিতা হয়ে শান্তনু সহ্য করতে না পেরে অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে গঙ্গার পুত্র বিসর্জনকর্মে বাধা দেন। গঙ্গা তখন প্রকৃত সত্য শান্তনুকে জানান— হিমালয়ের তুষারভূমিতে বাসযোগ্য এক সন্তান তিনি চান। তাই সন্তান জন্মালে তাকে তুষারক্ষেত্রে রেখে আসেন, যদি সে সন্তান জীবিত থাকে তবেই তাকে লালনপালন করবেন। কেবল অষ্টম গর্ভের সন্তানই তুষারক্ষেত্রের যন্ত্রণা সহ্য করতে সচেষ্ট বলে গঙ্গা তাকে নিয়ে যাওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। উদ্দেশ্য, শাস্ত্র-শিক্ষায় পারদর্শী করে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন রক্ষার জন্য পাঠাবেন। বিদায়কালে গঙ্গা পুনর্বার মনে করিয়ে দেন—

"আমরা কোনও একক পুরুষের ঘর করি না। কারও বশ্যতা স্বীকার আমাদের ধর্ম নয়।"[৮]

লেখিকা গঙ্গাদেবীকে অঙ্কন করতে গিয়ে নাগরিক সমাজের পুরুষের সাথে পা মিলিয়ে চলা অনন্যাদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ করেছেন। আজকের সমাজে কেবল মাতৃ পরিচয়ে সন্তান পালিত হচ্ছে, নারীরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর শক্তিসাধনার বলে রাজ্য-দেশ পরিচালিত হচ্ছে— এহেন ভারতমাতার প্রতিরূপ খুঁজে পাই লেখিকার বিবিধ বিনির্মিত আখ্যানে। বশিষ্ঠের তপোবনে গঙ্গা তাঁর সন্তান দেবব্রতকে লালন-পালন করেন। দেবব্রতের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে—

"শান্তনুঃ খলু গঙ্গাং ভাগীরথীমুপযেমে
তস্যামস্য জজ্ঞে দেবব্রতঃ।।
যমাত্তভীষ্ম ইতি।।
ভীষ্ম খলু পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া সত্যবতীং মাতরমুদবাহয়ৎ।।
যামাহুর্গন্ধকালীতি।।"[৯]

আখ্যানে উল্লেখ রয়েছে, গঙ্গার আদর্শে বড় হয়ে ওঠা দেবব্রত নিজ পিতার হৃদয় বেদনা নিবারণ করতে গিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে নিজ দায়িত্বে পিতার সাথে ধীবরকন্যার বিয়ে দেন। পিতার কথামত দেবব্রত ধীবরকন্যা কালিন্দীকে কুরুবংশের মহিষী বানাতে উদ্যত হন। কালিন্দী হয়ে ওঠেন সত্যবতী। সত্যবতীর প্রেমপুরুষ ভাগ্যের পরিহাসে তাঁর সতীন পুত্র। লেখিকা দেখিয়েছেন রাজমহিষী হয়েও সত্যবতী প্রেম নিবেদন করেছেন যুবরাজ দেবব্রতের প্রতি। অত্যন্ত

সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে, অকুণ্ঠচিত্তে তিনি তাঁর গর্ভে দেবব্রতের ঔরশজাত সন্তান ধারণের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এই দৃশ্য মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-উত্তর নারী স্বাধীনতার এক অনন্য আখ্যানের দাবি রাখে। মহাভারতের ভীষ্মদেব হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন রক্ষায় সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে অলংকৃত করালেও তিনি সুরা-নারীর প্রমোদে মেতেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে দেবব্রতকে সিংহাসনে না বসেও রাজ্য পরিচালনা করতে হয়। লেখিকা বাণী বসু দেবব্রতের ত্যাগ-তপস্যা প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন—

> "ইতিহাস আর সব ভুলে যায়, নাম মনে রাখে, মুছে দেয় নামের পিছনে কাজের মানুষের পরিচয়। কিন্তু দেবব্রত এসব ভাবেন না। রাজ্যটিকে তাঁর ছেঁড়া পাল ভাঙা হাল মনে হওয়া সত্ত্বেও পারে পৌঁছে দেবার সংকল্পটাও তো তাঁর অন্য প্রতিজ্ঞাটারই সমবয়সি। আর তাঁর এ সংকল্প বিচিত্রবীর্য নিরপেক্ষ।"[১০]

দেবব্রত পিতার শান্তিতে নিজ প্রাণপ্রেয়সীকে বিসর্জন দিয়েছেন। এমনকি প্রতিজ্ঞা করেন রাজসিংহাসনে বসবেন না। শত অস্থির পরিস্থিতিতেও দেবব্রত সিংহাসনে না বসেও আড়ালে থেকে রাজ্য সামলেছেন। যে ধীবর কন্যার রূপে প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হন পরিস্থিতির কারণে তাঁকেই মাতা রূপে মেনে নিয়েছেন। সেই ধীবর কন্যা প্রেম নিবেদন করলেও সসম্মানে তা প্রত্যাখ্যান করে ক্ষত্রিয় সংযমতার পরিচয় দিয়েছেন এবং মাতা বলে সম্বোধন করেছেন। এ হেন দেবব্রতই কালিন্দীকে শাস্ত্র-নীতি-বিদ্যাচর্চার মধ্যে দিয়ে সত্যবতী করে তুলেছেন ; আর প্রত্যক্ষ করেছেন কালিন্দীর সত্যবতী হয়ে ওঠার অসীম ইচ্ছে।

> "সহজাত বোধে কি সে বোঝেনি এই কৃষ্ণা পাটনি এক দুর্মূল্য রত্ন, এর চলাফেরা, বাচন, এর চোখের চাউনি, সব কিছুর মধ্যে একটা সাম্রাজ্য জয় করার গরিমা আছে যা রাজকুমারীদের মধ্যেও দুর্লভ। প্রমাণ তো হল? কত তাড়িতাড়ি সে আয়ত্ত করল শাস্ত্রের পাঠগুলি? কত অনায়াসে হাতে তুলে নিল রাজসংসারের কর্তব্য ! এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর মেধা তার সঙ্গে দায়িত্ববোধের সমন্বয় তো এখনও দ্বিতীয়টি আর দেখলেন না কুমার। চঞ্চলা অথচ মহিমময়ী,সাহসিনী অথচ কী আত্মমর্যাদাবোধ! কৃষ্ণা নিশীথিনীর দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকেন দেবব্রত।"[১১]

বিচিত্রবীর্যকে কামাসক্ত জীবনযাপন থেকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনার জন্য বিয়ের আয়োজন করেন। দেবব্রত কাশীরাজের কন্যাদের স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রিত না হয়েও তিন রাজকন্যাকে একপ্রকার অপহরণ করে নিয়ে আসেন। তিন রাজকন্যার মধ্যে অম্বা শাল্বরাজকে ভালোবাসতেন। মহাভারতে পাই অম্বা নিজে আত্মত্যাগ করেন, কিন্তু অভিশপ্ত ভীষ্মদেবের হত্যাকারী রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন শিখণ্ডী নামে। লেখিকা সচেতনভাবেই সে প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত না করে অম্বিকা, অম্বালিকার জীবন সংগ্রামকে আখ্যানরূপ দিয়েছেন।

অম্বিকা, অম্বালিকা স্বামী রূপে বিচিত্রবীর্যকে বরণ করে নেন। কিন্তু তাঁদের সিঁথির সিঁদুর দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। নারীর দুরাবস্থা যে কেবল সাধারণ জনমানসেই নয়, রাজপুরীতেও বিরাজ ছিল– সেই চিত্র লেখিকা নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। বিচিত্রবীর্যের দেহত্যাগের পর বংশে কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় হস্তিনাপুরের সিংহাসন বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে সত্যবতী তাঁর প্রথম সন্তান কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে আহ্বান করেন। কৃষ্ণ সাত বছর বয়স থেকে কেবল শাস্ত্র পাঠেই নিমগ্ন। মাতা সত্যবতী কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন নিঃসন্তান ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের গর্ভে সন্তান দান করার। সত্যবতী ঘোষণা করেন এতে কোনো অন্যায় নেই।

> "ক্ষত্রিয়দের আইন বলছে কোনও রাজপুরুষ নিঃসন্তান মারা গেলে, উপযুক্ত কোনও ব্যক্তি তাঁর বধূকে সন্তান দিতে পারে। এ ব্যাভিচার নয়, সম্পূর্ণ ধর্মসঙ্গত নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া একটি। এই ক্ষেত্রজ পুত্র মৃত পিতার উত্তরাধিকার পায়। সমাজ বিধি এবং ধর্ম এই নিয়োগপ্রথা সমর্থন করেছে।"[১২]

এরপরই হস্তিনাপুরের রাজবংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসের রক্ত প্রবাহমানতার সূত্রপাত। বেদব্যাসের মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে—

> "সা তমুবাচ ভ্রাতা তবানপত্য এব স্বর্যাতো বিচিত্রবীর্য্যঃ।
> সাধ্বপত্যং তস্যোৎপাদয়েতি।।
> স তথেত্যুক্ত্বা ত্রীণ্যপত্যান্যুৎপাদয়ামাস—
> ধৃতরাষ্ট্রং পাণ্ডুং বিদুর ঞ্চেতি।।"[১৩]

অর্থ্যাৎ মাতৃ আদেশ পালনের ফল স্বরূপ বেদব্যাসের ঔরসজাত তিন সন্তানের জন্মলাভ- ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। এভাবে সমগ্র আখ্যানে কালিন্দী তথা সত্যবতী চালিকাশক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। লেখিকা 'কৃষ্ণ' আখ্যানে বেদব্যাসের ঔরসজাত তিন সন্তানের সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন। আখ্যানটিকে 'কালিন্দী'র 'সিক্যুয়েন্স' হিসেবে মেনে অসুবিধে হয় না। অম্বিকা যদিও প্রথম দর্শনেই দেবব্রতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীতে রাজপরিবারের কথা ভেবে, শাশুড়ির আদেশ পালন করতে গিয়ে নিজ গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সন্তান ধারণে বাধ্য হন। যে কৃষ্ণ এতকাল নিজ কৌমার্য সাধনায় নিজেকে অটুট রেখেছিলেন তাঁকেই হঠাৎ মাতৃ আদেশ পালনের জন্য সেই কৌমার্যভঙ্গে বাধ্য হতে হয়। এতে তিনি অস্থির ও চিন্তিত হয়ে ওঠেন। মাতৃ আদেশ পালন করতে গিয়ে তিনি একে একে অম্বিকা, অম্বালিকা সঙ্গে মিলিত হন। এমতাবস্থায় তিনি এক দাসীর কোলে শান্তির নিশ্বাস খুঁজে পান।

'কৃষ্ণ' আখ্যানে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আশ্রম জীবন বর্ণিত করেছেন। জ্ঞানচর্চায় পারদর্শী মুনি এবং রচনায় বিদগ্ধপুরুষ ঋষি পরাশরের জীবনে নতুন পরীক্ষা শিশু পালন। আগেই জেনেছি কালিন্দীর গর্ভজাত পরাশরের সন্তান হলেন কৃষ্ণ। আশ্রম, দীক্ষা, জ্ঞানপাঠ জীবনের অভেদ্য কর্ম হলেও কালিন্দীকে দেওয়া বচন পরাশরকে রক্ষা করতেই হবে। কৃষ্ণকে তিনি এমনভাবে মানুষ করবেন যাতে সে মার বিপদে-আপদে সর্বদা পাশে থাকে। সেই সংকল্প যথাযথ পালনে পরাশর বদ্ধপরিকর। কৃষ্ণ শৈশবে মাতৃস্নেহের আস্বাদ উপভোগ করতে পেরেছেন সামান্যই। শূনক বা বভ্রীর মার মত তাঁর মাও কেন সবসময় তাঁর পাশে থাকে না? বালক কৃষ্ণের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ধ্যানমত্ত উদাসীন পিতা পরাশরের বনমধ্যে অবস্থিত আশ্রমে বালক কৃষ্ণের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা। তিনি নিজ জন্মবৃত্তান্ত এবং পিতামাতার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে বাল্যাবস্থায় অবহিত হন। তাই তাঁর একাকীত্বের জীবনকে অগোছালো অযত্নময় রেখেই আনন্দ পান।

> "ঈশ্বরদত্ত সেই কুৎসিত রূপটা লোকের কাছে একটা বালকের স্নেহ পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। এই নিষ্ঠুর সত্য তাঁর সামনে উদঘাটিত হয়ে গিয়েছে। বাবা বাবার মতো নয়, মা অন্যের ঘরনি, নিজের আশ্রয় স্বরূপ যে তপোবনে সব পশু-পাখি দয়া-মায়া পায়, সেখানে মুনি, মুনিপত্নী, মুনি পুত্র, মুনিদাসদের সে একটা অসহায় বাচ্চার প্রতি নিষ্করুণ হতে দেখেছে। পৃথিবীটা এই, জীবনটা এইরকম ভেবে তার রাতে ঘুম আসে না।"[১৪]

বালক কৃষ্ণ শাস্ত্রপাঠ ও অধ্যয়নে অধিক মনোনিবেশ করেন। একদা পিতার কাছে একক ভাবে 'বিষ্ণুপুরাণ' লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। পাশাপাশি আরও কিছু সহায়কের দ্বারা 'বেদসংহিতা'র কাজ করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। পিতার কাছে শোনা গল্প কাহিনিগুলি তিনি যুক্তির আঙিনায় লিপিবদ্ধ করতে চান। সমুদ্রমন্থনে বাসুকি নাগের রজ্জু হওয়া, মন্দার পর্বতের মন্থনদণ্ড- এইসব গল্পকথাকে তিনি কিছুটা পরিবর্তন করে সত্যরূপ দিতে চান। সময়দ্রষ্টা অধ্যাত্মপুরুষ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধর্মনির্ভর অন্ধ স্বার্থপরতাকে উন্মুক্ত চিত্তে প্রকাশের লক্ষ্যে তিনি ব্রতী হতে চেয়েছেন।

> "এই যে ধরুন বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধরে অমৃত পরিবেশন করলেন, অসুরদের দিলেন না... ঈশ্বর কি এমন একদেশদর্শী?"[১৫]

তবে তিনি তা পূর্বজদের উল্লেখিত পথকেই অনুসরণ করে লিখেছেন। কিন্তু সে পথ হবে যুক্তির সাশ্রয়ে মলিনতা দূরীকরণের পথ। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 'ঘোরকলি' গ্রন্থে অখণ্ডকালকে চারটি যুগে ভাগ করে তার সময়সীমা উল্লেখ করেছেন।

> "সত্যযুগের আয়ুষ্কাল- ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতাযুগের আয়ুষ্কাল-১২,৯৬,০০০। দ্বাপরযুগের আয়ুষ্কাল- ৮,৬৪,০০০। কলিযুগের আয়ুষ্কাল- ৪,৩২,০০০ বছর।"[১৬]

কলির আগমনের অনেক পূর্বেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপলব্ধি করেছিলেন- সম্পদ যেমন পেলেই হবে না, তা সময়ে 'শ্রী' রূপে পাওয়া প্রয়োজন। ধন্বন্তরি মুক্তি দিলেও তার একহাতে রয়েছে নিরাময়ের ঔষুধ, আরেক হাতে বিষ। তাই তিনি পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি-রহস্যকে উদঘাটন করতে পেরেছিলেন। মুনিরা তাঁদের পূর্বজ গুরুর থেকে যে সকল শাস্ত্র কথা শুনতেন, সেগুলিই শ্রোতাদের শোনাতেন। সে ক্ষেত্রে কোনও রকম তথ্য পরিবর্তন বা তথ্য বিকৃতি করতেন না। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সে তথ্যগুলির ব্যাখায় নিমগ্ন হন। আর কলির প্রাককালেই শাস্ত্রকে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নেন। রাজা পরীক্ষিতের দেহাবশেষের মধ্য দিয়ে দ্বাপরের অবসান হয় এবং কলির আগমন ঘটে। দ্বাপর-কলির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে পিতার থেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জেনেছিলেন-

> "এখন এই দ্বাপর যুগ অনেক কিছুই খুইয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস খোয়ায়নি, সাধারনজন ওই বিশ্বাস নিয়েই বাঁচে, ওটাই তাদের জীবনের চালিকাশক্তি। কিন্তু কলিযুগ আসছে। সে যুগ সন্দেহ, সংশয়, অনাচারের কাল। তখন,তখন মানুষ উত্তর খুঁজবে, ব্যাখা খুঁজবে।"[১৭]

পরাশর সন্তানকে সংসারধর্মে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান। জাবালির কন্যা পিঙ্গলা ছ-সাত বছর বয়স থেকেই কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। পলাশ তরুমূলে যখন কৃষ্ণকে একাকী নির্জনে বসে কাঁদতে দেখেছিল, তখনই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় পিঙ্গলা। কৃষ্ণের কণ্ঠচ্চারিত সকল গল্পই পিঙ্গলার প্রাণকে জুড়িয়ে দিত। দশ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণকে নাম ধরেই সে ডাকত। দিনে একবার না দেখতে পেলে পিঙ্গলা অস্থির হয়ে যেত। মুনিবর জাবালিও কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ভবিষ্যতে জগৎখ্যাত হওয়া কৃষ্ণের কাছে জাবালি মুনি কন্যাদান করার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কৃষ্ণ পাত্রীর নাম পিঞ্চলা শুনে প্রথমাবস্থায় অবাক হয়। কারণ আঠারো উর্দ্ধ পিঙ্গলাকে আজও সে বালিকাই ভাবে। অবশেষে পিতার আদেশে কৃষ্ণ বিবাহ করতে রাজি হলেও বাঁধ সাধে মলামাস (কার্তিক)। পরাশর তীর্থভ্রমণে বেড়িয়ে যাওয়ার আগে বিবাহের অনুমতি দিয়ে যান। কিন্তু বিবাহের পূর্বেই কৃষ্ণের জন্মদাত্রী মা স্মরণ করায় তাঁকে হস্তিনাপুরের রাজপুরীতে যেতে হয়। মার ইচ্ছেপূরণে ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান ধারণে দায়বদ্ধ হন। আশ্রমে ফিরে ভালোবাসার প্রণয়ী পিঙ্গলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু আরও একবার মাতার আদেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে হস্তিনাপুরের রাজপুরী যেতে হয়। অম্বিকার পুত্রকে দেখে অন্ধরূপে জন্ম নিয়েছে— ধৃতরাষ্ট্র। অম্বালিকার গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে রোগাগ্রস্ত পাণ্ডু শিশু— ধৃতসত্ত্ব। তবে দাসীর গর্ভজাত কৃষ্ণের সন্তান রাজলক্ষণ যুক্ত হয়েছে- ধৃতবীর্য। কিন্তু দাসী সন্তান পরিচয়ে ধৃতবীর্যের রাজা হওয়া প্রায় অসম্ভব। আশ্রমে সাধারণের আবহে দিনযাপন করা কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের রাজপুরীর রাজনীতির জটিলতা দেখে হতচকিত হয়ে যান। দাসীর গর্ভজাত সন্তানই যে ধর্মশীল, বিনয়ী হবে যা রাজার লক্ষণ সুলভ, সে বিষয়ে কৃষ্ণ দৃঢ়শীল। তিনি উপলব্ধি করেন এই রাজপুরীই হয়তো মানুষদের ধূর্ত, অনাচারি, রাজনৈতিক স্বার্থপর করে তোলে!—

> "সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছেন তিনি সত্যবতীর পরিবর্তনে। নিজে 'শূদ্র' হয়েও তিনি আরেকজন শূদ্রাণীর মনের ব্যথা, তার অধিকারবোধ বুঝতে পারেন না। দাসীর পুত্রটিকে তাঁরা চুপচাপ কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন, তার মানে? তার অন্তর্নিহিত মানে কি? মানে হল, শূদ্র জাতীয় কেউ রাজা হতে পারে না- একথার রাজনীতি আসলে বিশ্বাস করে না– সবটাই লোকাচার, লোকসমাজ! অথচ সেই একই রাজনীতির সদ্যবিধবা বধূকে পরপুরুষের কাছে যেতে বাধ্য করে। এত এঁদের প্রতাপ। যে কোনও 'অনাচার'কে এঁরা ধর্মের দোহাই দিয়ে গঙ্গাজলশুদ্ধ করে নিতেই পারেন। অথচ দাসীপুত্র বিদুরের বেলায় তা কিছুতেই করলেন না।"[১৮]

হস্তিনাপুরের রাজশিশুদের ক্রীড়াঙ্গনে খেলার সময় ধৃতসত্ত্ব (পাণ্ডু) সকল শিশুর আগে চলে গেলে পরিহাসের সুরে পেছন থেকে কেউ বলে ওঠে–

"যতই দৌড়স, যতই আগে যাস, তুই তো পাণ্ডু! পাণ্ডু! পাণ্ডু উউউ!"[১৯]

এমতাবস্তায় দাসীর সন্তান ধৃতবীর্য (বিদুর) তাঁর দুই ভ্রাতাকেই সামলে রাখেন। বালক বয়সেই ধৃতবীর্য অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত পরায়ণ। সত্যবতী সূক্ষ্ম বিচারে বুঝতে পারেন ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়বল, সৌম্য, রাজাশীলগুণ সকলই রয়েছে। আর সবসময়ই ধৃতরাষ্ট্রকে আগলে রয়েছে বিদুর। দেবব্রত সত্যবতীকে কথোপকথনে বলে ধৃতসত্ত্ব অস্ত্রনিপুণ, তবে তাঁর নেতৃত্বের শক্তি নেই। ধৃতরাষ্ট্রের কেবল নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি রয়েছে। আর ধৃতবীর্য বুদ্ধিমান, কূট কিন্তু অস্ত্রনিপুণ নয়। দেবব্রত দৃঢ়তার সাথে জানান-

"দেবী কেউ এককভাবে উঠে আসছে না, অথচ... তাদের সম্বিলিত শক্তির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। প্রচুর..."[২০]

তবে ধৃতরাষ্ট্র সকলের জ্যেষ্ঠ বলে তাকেই সত্যবতী অধিক প্রাধান্য দিতে চান। আর দেবব্রতের চোখে ধৃতবীর্য অধিক প্রিয়। সে ধৃতরাষ্ট্র-ধৃতসত্ত্ব উভয়কেই আগলে রেখেছে। ধৃতরাষ্ট্র যখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে তখন ধৃতবীর্যই কেবল তাঁকে শান্ত করতে পারে। ধৃতসত্ত্বকে বড় ভাই পাণ্ডু বলে ডাকে বলে মনে কষ্ট হয়। এই মনকষ্টের সমাধানও খুঁজে দেয় ধৃতবীর্য। এহেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সন্তানকে রাজপুরীর লোকেরা 'ক্ষত্তা' বলে সম্বোধন করেন। এই ক্ষত্তার অর্থ—

"দাসিপুত্র- আমার মা বড় মায়ের দাসী- তাই"[২১]

হস্তিনাপুরের রাজপুরীর তিন ভ্রাতা শাস্ত্র-অস্ত্র-শিক্ষাগুণে পারদর্শী হয়ে ওঠার পর রাজসিংহাসন কে অলংকৃত করবেন? তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, বাদ- বিবাদ চলতেই থাকে। সকলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র ও ধৃতসত্ত্ব। সভার কেউই বিদুরের প্রসঙ্গ তোলেন না। মহাভারতেই উল্লেখ রয়েছে- নীচকুল জাতি কিংবা শূদ্র যদি নিজ কর্মফল ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভে পারদর্শী হয়, তবে আপন কর্মগুণে ব্রাহ্মণ তুল্যও হতে পারেন।

"ঐতেঃ কর্ম্মফলৈর্দেরি! ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ। শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।।"[২২]

ধৃতবীর্যের সম্রাট হওয়ার সমস্ত গুণ থাকার পরও তাঁর স্থান হয়েছে রাজপুরীর বাইরের কুঠিরে। বাণী বসু 'ক্ষত্তা' আখ্যানবৃত্তে বিদুরের বঞ্চনা-অবমাননার এই দিকগুলিই অধিক মাত্রায় তুলে ধরেছেন।

হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন অলংকৃত করার পর পাণ্ডুর সহিত কুন্তিভোজ রাজ্যের রাজকুমারী পৃথার বিবাহ হয়। পাণ্ডু-পৃথার দাম্পত্যজীবন সুখেই কাটছিল। কিন্তু সন্তান না হওয়ায় বছর খানেক যেতেই ভীষ্মদেব পাণ্ডুর জন্য দ্বিতীয় পত্নী রূপে মদ্ররাজের কন্যা মাদ্রীর সাথে পুনঃবিবাহ দেন। উভয় পত্নীই স্বামী অনুরাগী ছিলেন। বিদুর ব্যতীত রাজপুরীর সকলেই অজ্ঞ ছিলেন যে পাণ্ডু সন্তান ধারণে অক্ষম। তাই বিদুরের পরামর্শ মত বনে বনে পত্নীদ্বয়কে নিয়ে মৃগয়ায় যান পাণ্ডু। এই আশায় যে, যদি কোনও মুনি-ঋষির আশীর্বাদে সন্তান লাভ করতে পারেন। কিন্তু এই ইচ্ছে পূরণ হয় না, বরং কিমিন্দক মুনি যখন মৃগয়া বেশে বিহার করছিলেন সেই মুহূর্তে পাণ্ডু তাঁকে হরিণ ভেবে হত্যা করায় অভিশাপগ্রস্ত হয়। অবশেষে ব্যাসদেবের নৈমিষারণ্য হয়ে তপস্বীবেশে পত্নীদ্বয়কে নিয়ে হিমালয়ের উত্তর পর্বতে চলে যান। হস্তিনাপুরের এই রাজবংশকে একদিন উত্তরাধিকারের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন স্বয়ং ব্যাসদেব। আবার স্বয়ং তিনিই তাঁর পুত্র বিদুরকে আদেশ করেন বংশের প্রদীপকে সমুজ্জ্বল রাখার জন্য ভ্রাতুষ্পত্নীর গর্ভে সন্তান দান করতে। যদিও কুন্তীর স্বয়ংবর সভায় প্রথম দর্শনেই বিদুর আকৃষ্ট হয়েছিলেন কুন্তীর রূপ-কর্ম-বিদ্যায়। কিন্তু বিদুরের বর্তমান অনুভব—

"নিয়োগ কোনও প্রণয় নয়, শুধু উপকার। শুধু দান। কিছু ফিরে পাওয়া গেলেও তা প্রকাশ করা চলবে না।"[২৩]

বাণী বসু 'ক্ষত্তা' আখ্যানে দেখিয়েছেন অবশেষে বিদুরের সংসর্বে কুন্তীর সন্তান জন্ম হয়- যুধিষ্ঠির। পাণ্ডু এক সন্তানে সন্তুষ্ট নয়। তাই কুন্তী দুর্বাসা মুনির থেকে প্রাপ্ত বরকে দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে পান। এরপর ইন্দ্র- কুন্তীর মিলনে দুই সন্তান হয়- ভীম ও অর্জুন। পতীর আদেশে মাদ্রীও কুন্তীর প্রাপ্ত মন্ত্রবলে দুই যমজ সন্তান লাভ করেন- নকুল ও সহদেব।

"পাণ্ডু আহ্লাদে বিগলিত হয়ে বলেন- জ্যেষ্ঠটি আমার ধর্মপুত্র। দ্বিতীয়টি পবনপুত্র স্বয়ং হনুমানের ভাই। তৃতীয়টি ইন্দ্রতনয়, তারপরে বাকি দু'জন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আশীর্বাদ।"[২৪]

যদিও মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে কুন্তীর তিন সন্তানই মন্ত্রবলে প্রাপ্ত। লেখিকা সচেতন ভাবেই যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের ঔরসজাত সন্তানরূপে অঙ্কন করেছেন। কারণ যুধিষ্ঠিরের ধীর স্থিরশীল বিচার, সংযমতা, বুদ্ধি সবটাই যেন বিদুরের সমতুল্য। পাহাড়ের ঋষিপত্নীরা এবং মাতাদ্বয়ের আদরে পঞ্চসন্তান বড় হয়। তবে পাণ্ডুর মনে পৃথার প্রতি বিতৃষ্ণার পারদ বাড়তে থাকে। সন্তানদের স্নেহ করতে গেলেও মনে যন্ত্রণা হয় যে, একটি সন্তানও তো তাঁর নিজের নয়। কিমিন্দক মুনির অভিশাপের ফলে পাণ্ডুর মৃত্যু ঘটে এবং মাদ্রীও দেহত্যাগ করেন। লেখিকা 'ক্ষত্তা' আখ্যানে পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুরহস্যকে উত্থাপন করেছেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে সতেরো দিন পরে ঋষি, কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব মিলে হস্তিনাপুরে শবদেহ নিয়ে ফেরেন। কিন্তু লেখিকার অনুসন্ধিৎসু অভিমত- দুর্গম পথ হয়ে মৃতদেহ নিয়ে হস্তিনাপুরে কি পৌঁছানো সম্ভব? তাছাড়া সতেরো দিন কি মৃতদেহ অবিকৃত রাখা যায়? তাই লেখিকার অনুমান মৃতদেহগুলি পাহাড়েই দাহ করে ভস্ম নিয়েই রাজ্যে ফিরেছিলেন পঞ্চসন্তান সহ কুন্তী। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের সাথে পঞ্চপাণ্ডব বড় হতে থাকলেও বাল্যাবস্থা থেকেই উভয় দলের মধ্যে দ্বেষ-হিংসার জন্ম নেয়। তাই বিদুর নিজ সন্তানদের সাথে পঞ্চপাণ্ডবদের শিক্ষাদান করান এবং বিশেষ নজর দেন যুধিষ্ঠিরের প্রতি। দুর্যোধন পাণ্ডবদের ক্ষতি করতে চাইলেও বারংবার তাতে ব্যাঘাত ঘটায় বিদুর ও তাঁর গুপ্তচর বাহিনী। বুদ্ধি, সংযম, কূটনীতির বলেই যে রাজসিংহাসনের অধিকার লাভ এবং দীর্ঘসময় শাসন করা সম্ভব তা মহাভারতের পাঠকের কাছেও বোধগম্য। পাণ্ডবদের উচ্ছেদ করতে দুর্যোধন বাহিনীর পরিকল্পনা, শকুনীর চতুরতা, আবার পাণ্ডবদের সিংহাসন পুনঃলাভের জন্য কৃষ্ণের সহায়তা, শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি-যুক্তি-ধৈর্য্যের বলে পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়- সবই পাঠকের যুক্তি-বুদ্ধির পথকে প্রশস্ত করে। প্রসঙ্গত বলা যায়-

"মহাভারত কেবলমাত্র মহাকাব্যই নয়, একাধারে ইতিহাস ও রাজনীতি।ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় কালক্রমের যথাযথ উপস্থাপনা অনিবার্য। অন্যথায় পাঠকের মনে ঐতিহাসিক চেতনার সঞ্চার ব্যর্থতায় পরিণত হয়। মহাভারতকারও যে কৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেছেন, তিনি যথাযথ কালক্রমের অনুষঙ্গে গ্রথিত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। ফলে মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক কালের এক কূটনীতিজ্ঞ বীরের চরিত্র।"[২৫]

মহাভারতের উল্লেখযোগ্য তিনজন ক্ষাত্রবধূ হলেন গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী। এই তিনজনের প্রকৃত নামের সন্ধান মেলা কঠিন। গান্ধার দেশের কন্যা বলে নাম হয়েছে গান্ধারী, কুন্তিভোজের কন্যা কুন্তী নামে এবং মদ্রতনয়া মাদ্রী নাম নিয়ে হস্তিনাপুরের রাজপুরীকে রক্ষা করে চলেছেন। যদিও মহাভারতে পার্থের মাতা হিসেবে পৃথা নামটি ক্ষণিকের জন্য কয়েকবার পাই। বাণী বসু 'ক্ষত্রবধূ' গ্রন্থে পরিবার জাতির ভার বহন করে আসা শোষিত পরাধীন মহাভারতের নারীদের চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিবাহিত জীবনে পদার্পনের পর গান্ধারী আজীবন চোখে পট্টি বাঁধার জন্য লেখিকা নাম দিয়েছেন 'চক্ষুষ্মতী' বা 'অনঞ্জনা'—

"অনঞ্জনা মানে যার অঞ্জন বা কাজল লাগে না, ছায়াময় পল্লবঘেরা এমনই চোখ দুটি।"[২৬]

ধৃতরাষ্ট্রের জন্য পাত্রী সন্ধানে স্বয়ং দেবব্রত (ভীষ্ম) যুদ্ধ সাজে গান্ধার রাজসভায় সুবলরাজের নিকট হাজির হন। কন্যা প্রার্থনা করলেও প্রকারান্তে তা যে ভীষ্মদেবের আদেশ, তা সুবল রাজকন্যাও বুঝতে পারেন। নিজ রাজ্যের কল্যাণের কথা ভেবে অনঞ্জনা (গান্ধারী) বিবাহে রাজি হয়ে যায়। কুরুবংশের জ্যেষ্ঠপত্নী হয়ে ভ্রাতা শকুনির সহিত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেন। সত্যবতী গান্ধারীকে পেট্টি খুলে ফেলার আবেদন করেন। কিন্তু গান্ধারী তা শুনতে নারাজ। তিনি যুক্তিতে বলেন—

"আমি তাঁর সহধর্মিণী। সহমর্মিণীও বটে। কোন প্রাণে তাঁর না দেখা পৃথিবীর ওপর চোখ রাখি?"[২৭]

কিন্তু প্রশ্ন জাগে গান্ধারীর পেট্টিটি আজীবন ধারণ করা কেবল কি স্বামী প্রেমের কারণে? যে স্বামীকে সে একবারের দৃষ্টিতে দেখতে পারেনি; কেবল গান্ধার রাজ্য রক্ষার জন্য নিজ মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে জন্মান্ধ কুরু যুবরাজকে বিবাহ করেছেন; সেই কুরুরাজ স্বামীর প্রতি প্রেম প্রথমাবস্থায় কতটা থাকতে পারে? তা বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। লেখিকা 'ক্ষত্রবধূ' আখ্যানে সত্যবতীর বচনের মধ্য দিয়ে গান্ধারীর পেট্টি পড়ার মূল অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করেছেন-

> "রাজসভায় যেমন অযোগ্য ধৃতরাষ্ট্র, অন্দরেও ততটা অযোগ্য থাকবে। এই মেয়ে নিশ্চিতভাবে কুরুকুলের ওপর তার অপছন্দের পাত্র চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে। সে কি জানে, যেখানে তার সমস্ত জীবন কাটবে- সেখানে এই অভিনব প্রতিশোধ অনুষ্ঠান তার নিজের স্বার্থ, নিজেরেই জীবন ছারখার করে দেবে?"[২৮]

গান্ধারী স্বামী প্রেমানুরাগের তুলনায় আত্ম-অভিমানী ছিলেন অনেক বেশি। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর প্রতি রাজপুরীর অন্যান্যদের ষড়যন্ত্র, আক্রমণ, ঈর্ষায় লিপ্ত হওয়া, ভয়-ভীতির আশঙ্কার কথা গান্ধারীকে জানায়। এ সমস্ত দুশ্চিন্তার কথা শুনেও গান্ধারী স্বামীর পাশে থেকে শত্রুদের চিহ্নিত করার লক্ষ্যে পেট্টি খুলে ফেলেননি। 'সহধর্মিণী' কথার অর্থ স্বামীর প্রতি সমভাবে সহায়সম্বল হওয়া। গান্ধারী কি কর্তব্য পালন করেছিলেন? নাকি কেবল জেদের বশবর্তী হয়েছিলেন- প্রশ্ন থেকেই যায়। লেখিকা উল্লেখ করেছেন গান্ধারীর গর্ভ থেকে সন্তান ধারণ সম্ভব নয়। আসলে গান্ধারী জড়িবুটি খেয়ে এবং নিজের উদরে আঘাত করে সন্তানধারনের কার্যক্ষমতা নিজেই নষ্ট করে ফেলেছেন। ব্যাসদেব গান্ধারীকে আশীর্বাদ করেছিলেন- সে শতপুত্রের জননী হবে। সেই বর সত্য প্রমাণে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে প্রস্তাব দেয় যে, ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে একশত রমণী গর্ভজাত হবেন। এ সংবাদ গোপন থাকবে, পাশাপাশি সকল সন্তানেরা গান্ধারীকেই তাদের মাতা বলে মনে প্রাণে মানবেন। লেখিকার যুক্তিকেন্দ্রিক মতামত হল গান্ধারী নিশ্চয়ই দিনের একটি সময় চোখের পেট্টি খুলতেন। তাই লেখিকার ধারণা গান্ধারীর একান্ত দাসী স্নানের আগে পেট্টিকা খুলে চোখ, নাক, কপাল সব টিপে টিপে ক্লান্তি-জড়তা দূর করাতেন। বাস্তবের যুক্তিকে আশ্রয় করে লেখিকা বিনির্মাণের প্রতিমা এঁকেছেন। কেবল অন্ধের মত বিশ্বাস নয়, বাস্তবের রূপান্তরকে সময়ের কালে চাপিয়ে সহজ-সোজা দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। কুরুবংশের শান্তনু, তাঁর পুত্র বিচিত্রবীর্য কিংবা ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ আনন্দ উৎসবময় ছিল না। তবে পৃথা পাণ্ডুকে নিজ স্বদিচ্ছায় বিয়ে করেছেন। কুন্তী-গান্ধারীর নিভৃত কথোপকথনে কুন্তী আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন-

> "আমি ক্ষত্রকন্যা, ক্ষত্রবধূ সবকিছুর জন্য প্রস্তুত আছি দিদি।"[২৯]

সেই আত্মত্যাগের বচন যে বাস্তবে তাঁকে স্বৈরিণী বানিয়ে দেবে তা কি কুন্তী জানত! হয়তো তিনি সে বিষয়ে সামান্য আশঙ্কাও করতে পারেননি। নিয়োগ প্রথায় ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্ম। পাণ্ডু সন্তানধারণে অক্ষম হওয়ায় কুন্তীকেও নিয়োগপ্রথায় সন্তান পেতে হয়। কেবলমাত্র স্বামীর ইচ্ছে পূরণের জন্য কুন্তীকে পরপুরুষের সংস্পর্শে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সেই স্বামী-সমাজ উভয়ের কাছে তাঁকে স্বৈরিণী অপবাদ পেতে হয়। নারীর আত্মত্যাগই নারীর আত্মহননের কারণ। লেখিকা কলমযুদ্ধের সহায়তায় মহাভারতের অন্যায়-অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। কাল্পনিকতাকে অধিক গুরুত্ব না দিয়ে যুক্তি-সত্য উপস্থাপনে অধিক মনোনিবেশ করেছেন। লেখিকা বিনির্মাণের পরাকাষ্ঠাকে নবনির্মাণে উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত তপোধীর ভট্টাচার্যের বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

> "পাঠকৃতিতে সব কিছু আছে- জ্ঞাতা এবং জ্ঞান, বিষয়ী এবং বিষয়, এমন কি হওয়া এবং না হওয়া। সেক্ষেত্রে বিনির্মাণ হয়ে ওঠে আসলে পরা-নির্মাণ। কার্য এবং কারণ, বহির্বৃত এবং অন্তর্বৃত, উপস্থিত এবং অনুপস্থিত, জগৎ এবং সত্তা- পুরোনো ধরনের দ্বৈততায় নয়, নবীন দ্বিবাচনিকতায় পাঠকৃতিতে অনবরত অন্বিত ও অনন্বিত হতে থাকে।"[৩০]

লেখিকার অবস্থানের নির্দিষ্টতা প্রমাণ দেয় তিনি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিকত্ব সৃষ্টি সাধনায় নিমগ্ন। 'ক্ষত্রবধূ' আখ্যানে দেখাতে চেয়েছেন গান্ধারী- কুন্তী- মাদ্রী তিন নারীর জীবনই ভাগ্যবিড়ম্বিত। দৈহিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করে অকালে প্রাণ হারায় মাদ্রী। কুন্তী স্বামী অক্ষমতার কারণে সন্তান লাভের জন্য পরপুরুষের নিকট যেতে বাধ্য হয়, উপরন্তু আবার স্বৈরিণী নামে অপবাদও সহ্য করতে হয়। পঞ্চসন্তানকে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরেও উপলব্ধি করেন চারিদিকে শত্রুবারুদের মাঝে সচেতনভাবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হবে। আর গান্ধারী শতপুত্রের মাতা হয়েও সন্তানধারনের অক্ষমতার জ্বালায় জর্জরিত।

'পাঞ্চাল কন্যা কৃষ্ণা' আখ্যান মহাভারতের পাঞ্চালীর জীবনসংগ্রামের নবনির্মিত রূপ। এই অগ্নি কন্যা প্রথমে পরিচিতি পান কৃষ্ণা নামে, পিতা দ্রুপদের পরিচয়জ্ঞাপক নাম দ্রোপদী আর দেশের পরিচয় সাপেক্ষে নাম হয় পাঞ্চালী। পুরাণকথা অনুসারে কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভার যে আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে বীর ভূমিস্থ পাত্রের জলে প্রতিবিম্ব দেখে ওপরে ঘুরন্ত চাকায় অবস্থিত মাছকে বধ করতে পারবেন, সেই হবেন কৃষ্ণার যোগ্যতম পুরুষ। কিন্তু এই স্বয়ম্বর সভার আয়োজনেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? সেই জিজ্ঞাসু মনোভাব নিয়েই লেখিকা এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্রুপদ ও তাঁর পুত্র ধৃষ্টদুম্ন পাণ্ডবদের বধ করে যদুবংশের বিনাশ ঘটিয়ে প্রতিশোধ নিতে চান। আর সেই কারণে পাণ্ডবদের সংসারে প্রবেশ করার জন্য নিজ কন্যার সাথে অর্জুনের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার কথা ভাবেন। কিন্তু এরই মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের মা কুরুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সকলে মেনে নেন যে তাঁরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে। কিন্তু দ্রুপদরাজের দৃঢ় বিশ্বাস পাণ্ডবরা বেঁচে আছেন এবং গা ঢাকা দিয়ে আছেন। তাই অর্জুনদের খোঁজ পেতে কন্যার স্বয়ম্বর সভায় ধনুর্বার প্রতিযোগিতা রাখেন। কারণ দ্রুপদ জানতেন অর্জুনই কেবল এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারবেন। স্বয়ংবর সভায় সূত পুত্র মহাবীর কর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগেই পাঞ্চালী তাঁকে বরণ করবে না জানান। প্রশ্ন হল পাঞ্চালী কি নিজ ইচ্ছেতেই কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন? লেখিকা এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন, প্রথম দৃষ্টিতে কর্ণকে ভালো লাগলেও পাঞ্চালী পিতার আদেশে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পিতৃগৃহ ত্যাগের পর পাঞ্চালীর আসল সংগ্রামের সূত্রপাত। পাঞ্চালীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব মায়ের কাছে ফিরে আসেন। যুধিষ্ঠির সচেতনভাবে মাতা কুন্তীকে বলেন তাঁরা উৎকৃষ্ট ভিক্ষে নিয়ে এসেছেন। আর কুন্তী কী সেই জিনিস তা না দেখেই সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলেন–

> "ভাগ করে নাও" [৩১]

লেখিকা মাতা কুন্তীর এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্চালীর বিবাহিত বিস্ময়কর জীবনকে নিয়ে কতকগুলি প্রশ্নের উত্থাপন ও যুক্তি খণ্ডন করেন। সন্তানদের সাথে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার পরও কুন্তী কি জানত না তাঁর পাঁচ সন্তান পাঞ্চালীর স্বয়ংবর সভায় গিয়েছে? সন্তানরা ভিক্ষে করে যা আনত সেটাও তিনি নিজহস্তে ভাগ করে দিতেন। তবে আজ কেন তা না করে কুন্তী সন্তানদেরই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার কথা বললেন? আসলে তিনি তাঁর সন্তানদের সর্বদা এক সুতায় বেঁধে রাখতে চান। তাই কিছুটা সজ্ঞানেই দ্রোপদীকে সেই সুতার অচ্ছেদ্য বন্ধন বানাতে চেয়েছিলেন। আরও একটি প্রশ্ন জাগে দ্রোপদী অর্জুনের অর্জিত হওয়ার পরও যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে কেন পাঞ্চালীকে বিয়ে করতে রাজি হলেন? আসলে যুধিষ্ঠিরের মনবাসনা প্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন-

> "ও পাঁচজনে মিলে এক নারীকে বিবাহ করবার সিদ্ধান্তটা তা হলে রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই না। যুধিষ্ঠির রাজা তাঁর মহিষী অগ্নিকন্যা পাঞ্চালী, তাঁর সৈনাপত্য করবেন আর চার বীর ভাই, এঁরা মিলিত ভাবে একটি সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তি এখনও হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু সেই দিকেই চলেছেন।"[৩২]

তাঁদের জীবন আসলে ঘর্ঘর ঘূন্যমান রথচক্রের ন্যায়। ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডবদের অনুর্বর খাণ্ডবপ্রস্থ দেন। কোনোও অভিমান না করেই মাতা-পত্নী সহযোগে পাঁচ ভাই মিলে কালোমেঘের বনমালীসম সেই ভূমিকে শস্যপূর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ গড়ে তোলেন।

পাঞ্চালীর পঞ্চস্বামীর সমস্যা সমাধানে নারদমুনি বিধান দিয়েছিলেন— প্রত্যেক পাণ্ডবের কাছে পাঞ্চালী একবছর করে থাকবে। তবে শর্ত হল পাণ্ডবের সাথে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে থাকার দৃশ্য যদি অন্য ভাইদের কেউ দেখে নেন তবে তাঁকে বারো বছর নির্বাসনে যেতে হবে। কিন্তু যুধিষ্ঠির সজ্ঞানেই অস্ত্রশালায় অর্জুনের সামনে পাঞ্চালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

হন। আর শর্তানুযায়ী অর্জুনকে বারো বছর বনবাসে যেতে হয়। যুধিষ্ঠির তবে কেন অর্জুনকে এই শাস্তির সম্মুখীনে ফেলেছিলেন? লেখিকা যুক্তি দিয়েছেন– আসলে যুধিষ্ঠির চেয়েছিলেন অর্জুন যেন পাঞ্চালীর প্রতি তীব্র আকৃষ্ট হয়ে তাঁর বীর স্বভাব, অস্ত্র প্রয়োগ ভুলে না যায়। পাশাপাশি পাঞ্চালীর প্রতি ক্ষণিক প্রণয় ঈর্ষাও ছিল। এরপর পাণ্ডব সংসারে বারো বছরের মধ্যে দ্রৌপদী চার সন্তানের জননী হয়ে উঠেন। এই দীর্ঘসময়ের অপেক্ষায় দ্রৌপদী-অর্জুনের প্রেমের মিলন অসমাপ্তই থেকে যায়। দীর্ঘ বারো বছর পর অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফেরেন। তাঁদের সঙ্গে আসেন সখা কৃষ্ণ। পাঞ্চালীকে দেখে কৃষ্ণের মমত্ববোধ জাগ্রত হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে অর্জুন স্বেচ্ছায় এত সহজেই বারো বছরের বনবাস গ্রহণ করলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কৃষ্ণের সাথে কৃষ্ণার কথোপকথনের মধ্যে পাওয়া যায়-

> "সবটাই তো বাধ্যবাধকতা মাধব, কী কাজ করবেন, অস্ত্র নিবেন কি না, দস্যু তাড়াতে যাবেন কি না, সবেতেই তো অনুমতি, একজন বীরপুরুষ যাঁর নিজেরই রাজা হওয়ার যোগ্যতা আছে, তাঁকে যদি এত অনুমতিসাপেক্ষ হয়ে দিনরাত থাকতে হয়, পত্নী পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষ।"[৩৩]

তবে সব বীরপুরুষই সেই বাঁধন থেকে মুক্তি চায়। এদিকে কৃষ্ণ কেবল তাঁর ভগিনীকে বীরযোদ্ধা অর্জুনের সাথে বিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। একপ্রকার কৃষ্ণের চতুরতায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবরা জয়ী হন। কৃষ্ণ নির্লোভী অর্জুনকে ক্ষমতার প্রলোভন জাগিয়ে মায়া-মমতাহীন ক্ষত্রিয় যোদ্ধায় পরিণত করেন। স্বেচ্ছায় খাণ্ডবদাহন ঘটান। প্রকৃতির প্রাণ জীবজন্তু, বনমানবরা মরলেও পাণ্ডবদের সাম্রাজ্য তো বৃদ্ধি পাবে! তাতেই কৃষ্ণ খুশি। কারণ ভগ্নীপতিকে জগৎ শ্রেষ্ঠ বীর বানানো যে তাঁর লক্ষ্য। মহাভারতের প্রধান চালিকাশক্তি যে দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা প্রমাণসিদ্ধ। নারী পুরুষের কাছে আদিমকাল থেকেই বঞ্চনার স্বীকার হলেও সমাজ সুসংগঠিত হয়েছে নারীকে কেন্দ্র করে। লেখিকা পুরাণ কাহিনী-চরিত্রকে কেন্দ্র করে সমকালীন চিন্তাচেতনার আবহে নবরূপে পাঞ্চালীর বন্দনা করেছেন। এই আখ্যানে পুরুষশাসিত আধুনিক জীবনাবর্তনে নারীর শোষণ-পীড়নে অবমাননার চলচ্ছবি রূপায়িত হয়েছে। সাধারণ সমাজব্যবস্থার বিপ্রতীপে বাণী বসুর এই আখ্যান নির্মাণ কিছুটা ভিন্ন আলোকদ্যুতি হিসেবে সমকালীন সমাজব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মহাভারতের পুরাণ-আশ্রিত বহুচর্চিত কাহিনিগুলি সময়ানুক্রমের রথচক্রে বহুমাত্রিক প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। ভারতীয় সমাজের সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক মূল্যবোধের আলোকে কেবল কৃষ্ণা-অর্জুন-দুর্যোধন নয়, পাশাপাশি সত্যবতী-গান্ধারী-কুন্তী-মাদ্রী-বিদুর প্রমুখ চরিত্রের অসামান্য অবদান লক্ষণীয়। একজন নারীর আত্মত্যাগ এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সংসারের উত্তরণ হলেও সংসারে নারীর মর্যাদা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকে গেছে। মহাভারতের নারী চরিত্রগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যক্ষমতা, সহনশীলতা, কুশলতা সর্বোপরি আত্মত্যাগ প্রশংসনীয়। অথচ মহাকাব্যের আলোচনায় নারী চরিত্রগুলি মলিন, অসংবেদনশীল কূটাভাস হয়ে থেকে গেছে। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের হাত ধরে প্রথম সমাজে নারীর এই অপরসত্তা আত্মস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। একুশ শতকের লিঙ্গ অন্যপেক্ষ সমাজবীক্ষার প্রেক্ষাপটে নারীর বিনির্মাণ প্রবণতা লক্ষণীয়। লেখিকা বাণী বসু তাঁর পুরাণ আখ্যান সিরিজে মহাভারতের চরিত্রগুলিকে গ্রহণ করে সময়োপযোগী সমাজবীক্ষায় তুলে ধরেছেন। একুশ শতকের যান্ত্রিক মানববিশ্বে মহাভারতের চরিত্রগুলিকে নিয়ে সমকাল চেতনার প্রেক্ষাপটে নবনির্মাণের এই প্রচেষ্টা আখ্যানবিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অভিমুখ।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ-জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০৫

২. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০১, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২২

৩. ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (টীকা, অনু.), মহাভারতম্, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস প্রণীতম্, আদিপর্ব্ব, ২য় খণ্ড, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩, পৃ. ৬৮৫

৪. বসু, বাণী, 'কালিন্দী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২২, দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, পৃ. ২৯
৫. ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ হরিদাস, তদেব, পৃ. ৬৯১
৬. বসু, বাণী, 'কালিন্দী', তদেব, পৃ. ১১২
৭. তদেব, পৃ. ৪৮
৮. তদেব, পৃ. ৪৯
৯. ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ হরিদাস, তদেব, পৃ. ১০৬৫
১০. ব সু, বাণী, 'কালিন্দী', তদেব, পৃ. ১৫৭
১১. তদেব, পৃ. ১৫৯
১২. তদেব, পৃ. ১৭৯
১৩. ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ হরিদাস, তদেব, পৃ. ১০৬৭
১৪. বসু, বাণী, 'কৃষ্ণ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৭
১৫. তদেব, পৃ. ৫১
১৬. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'ঘোরকলি', আনন্দ, কলকাতা- ৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৭
১৭. বসু, বাণী, 'কৃষ্ণ', তদেব, পৃ. ৬৭
১৮. তদেব, পৃ. ১২৪
১৯. বসু, বাণী, 'ক্ষত্তা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১২
২০. তদেব, পৃ. ২১
২১. তদেব, পৃ. ৪৩
২২. ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ হরিদাস, তদেব, অনুশাসন পর্ব্ব, পৃ. ১৫৬২
২৩. বসু, বাণী, 'ক্ষত্তা', তদেব, পৃ. ১০৮
২৪. তদেব, পৃ. ১২০
২৫. গিরি, সত্যবতী, 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩১
২৬. বসু, বাণী, 'ক্ষত্রবধূ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১০
২৭. তদেব, পৃ. ২৭
২৮. তদেব, পৃ. ২৯
২৯. তদেব, পৃ. ৪৪
৩০. ভট্টাচার্য, তপোধীর, তদেব, পৃ. ১০৭
৩১. বসু, বাণী, 'পাঞ্চাল কন্যা কৃষ্ণা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৫৩
৩২. তদেব, পৃ. ৬৪
৩৩. তদেব, পৃ. ১০৬